কার্য কারণ নীতি

ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalmoy Bhante

প্রশ্নোত্তরে
কার্যকারণ নীতি

সংকলন ও সম্পাদনায়

ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া

বি,এসসি, এ, এইচ (অনার্স), ডি, এইচ, এম, এস,
আই, সি, পি, এইচ, (নেদারল্যাণ্ডস), বি, সি, এস, (পশু সম্পদ)
গ্রাম- মায়ানী, ডাকঘর - আবুতোরাব
উপজেলা- মীরেরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম।

প্রশ্নোত্তরে কার্যকারণ নীতি

ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া

প্রকাশক
বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া
গ্রাম- গুমানমর্দ্দন, উপজেলা- হাটহাজারী,
জেলা- চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ
শুভ মধু পূর্ণিমা
১৪০৮ বাংলা, ২৪৪৫ বুদ্ধাব্দ, ২০০১ সাল।

দ্বিতীয় প্রকাশ
শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা
১৪১০ বাংলা, ২৫৪৭ বুদ্ধাব্দ, ২০০৩ সাল।

গ্রন্থ সত্ব
গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

শব্দ বিন্যাস ও মুদ্রণ
রাজবন কম্পিউটার
১৯, জি, এ, ভবন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান
নালন্দা, অভিজাত পুস্তক বিপণী
১৬৫, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

যাঁর জন্মে এবং কর্ম চাঞ্চল্যে ধন্য এবং গর্বিত মায়ানী গ্রামবাসী, যাঁর সান্নিধ্যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পেয়েছে সুখানুভূতি, কোমলমতি শিশুরা পেয়েছে আলোকিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এবং আর্ত পীড়িতরা পেয়েছে সুখের সন্ধান সে আলোকিত কর্মবীর পরমারাধ্য উপাধ্যায় শ্রীমৎ জিনলংকার মহাস্থবির, অধ্যক্ষ মায়ানী গৌতম বিহার কমপ্লেক্স, মহোদয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও নিরাময় দীর্ঘজীবন কামনায় আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এ অর্ঘখানি উৎসর্গিত হল।

শ্রদ্ধাবনত ঃ

ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া

মায়ানী, মিরেরসরাই।

প্রাক ভাষণ

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ তাঁদের সীমাবদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়কে আপন করায়ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য তাঁর সৃজনী ক্ষমতাকে বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভাবনে নিয়োজিত করে বিষয়কে সুশৃঙ্খলিত, সুবিন্যস্ত এবং পদ্ধতিগত রীতি নীতি উপস্থাপন করে আসছেন। প্রচলিত ধর্মগুলির আবির্ভাবকগণ তাঁদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে দুটো জিনিষ উদ্ভাবন করেন। তা'হল স্রষ্টা এবং সৃষ্টি। স্রষ্টা স্বয়ং আবির্ভূত হন এবং সৃষ্টি স্রষ্টার নিজের তৈয়ারী। স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে আদেশ নির্দেশ, বিধিবিধান, আদান প্রদানের নিয়ন্ত্রক। তিনি (স্রষ্টা) তাঁর সৃষ্টি থেকে কিছু চান, যেমন পূজা, প্রার্থনা, বন্দনা, স্তুতি, প্রশস্তি হত্যাযজ্ঞ, বলি এবং আরো কত কি? কিন্তু বুদ্ধ ধর্মে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তথাগত বুদ্ধ তাঁর নবাবিষ্কৃত ধর্মে স্রষ্টা সম্পর্কে কিছুটা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি (বুদ্ধ) স্রষ্টার গুরুত্ব না দিয়ে বরং কর্ম এবং কার্য কারণ শৃঙ্খলার উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সৃষ্ট জীবকে কারও নিকট মাথা নত করার প্রয়োজননেই বলেছেন। কারণ; বুদ্ধ ধর্মে সৃষ্টিকর্তার স্থান নেই কিন্তু সৃষ্ট বিষয়ের জন্য চিন্তা করার অবকাশ বুদ্ধ ধর্মে বিদ্যমান। বুদ্ধ ধর্মে সৃষ্টকে কার্য কারণ নীতির ধারা বা প্রবাহ বা বিবর্তনের নিয়ম বলা হয়েছে। কার্য কারণ নীতি বা বিবর্তন সম্বন্ধে চিন্তার পরিধি ক্রমবর্ধিত করার, গবেষণা করার, বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ কারণে বুদ্ধ ধর্ম প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মত কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ স্রষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায় নাই উপরন্তু মানুষের চিন্তা চেতনা শক্তিকে সতত জাগ্রত, গতিশীল, কৌতুহলী, উৎসাহী, ভাবনা এবং বিশ্লেষণধর্মী করতে অনন্য ভূমিকা রাখে। বুদ্ধ ধর্মে মানুষের কর্মশক্তির গতিময়তা এবং তার ফল অকালিক হওয়ায় মানুষকে বেঁচে থাকার উৎসাহ প্রদান করে এবং চিন্তার শক্তির খোরাক যোগায়। মানুষ নিজের কর্ম দিয়ে নিজের সুখ শান্তি অর্জন করে নিতে বুদ্ধ ধর্ম নির্দেশ দিয়ে থাকে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বার্ধক্য ও ব্যাধির যন্ত্রণায় যখন বাঁচার সকল আশা ভরসা ছেড়ে দেয়, বুদ্ধধর্ম তখন চিন্তাশক্তি আরো বর্ধিত করণের শক্তি যোগায় এবং বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। এটাই বুদ্ধ ধর্মের বৈশিস্ট্য এবং অন্ধ বিশ্বাসের মত সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছা, লীলাময়ের লীলার ভ্রান্ত অজুহাত দেয়নি। এখানেই অন্য ধর্মের সাথে বুদ্ধ ধর্মের বৈসাদৃশ্য। কার্য কারণ ধারায় জীবের বিবর্তনের বারটি স্তরের কথা বুদ্ধ ধর্মে ব্যক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি স্তর পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন এটির নিরোধে ঐটির নিরোধ হয়। যুক্তি হীন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোন কিছু গ্রহণ করলে সত্য উপলব্ধি কঠিন হয়ে উঠে এবং এটি মানুষকে অন্ধ অনুগামী করে তোলে। চার্লস ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরই প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তখনকার এ জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব অসত্য বলে প্রমাণ করেছেন। ভূতত্ত্ববিদ্যা, জীববিদ্যা ও শরীর বৃত্তিবিদ্যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বুদ্ধ শাস্ত্রের সযত্ন পাঠে বুঝা যায়, বিবর্তনবাদের আধুনিক এ তত্ত্বের সাথে বুদ্ধ ধর্মের কোন দ্বন্দ্ব নেই। খনিজ ভাণ্ডার, উদ্ভিদ জীবন ও অন্যান্য প্রাণীর

ক্রমবিবর্তনের সাথে বুদ্ধের প্রাচীন মতবাদ সামঞ্জস্য পূর্ণ।

প্রাণের অস্তিত্ব কিভাবে এল, বুদ্ধ এ প্রশ্নের সহজ অথচ যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন তিনি (বুদ্ধ) বলেছেন প্রাণ হল মন ও বস্তুর (নামরূপ) সমন্বয়। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমবায়ে নাম বা মন গঠিত হয়। আর বস্তুকে (রূপ) তিনি চারটি প্রধান উপাদানে বিশ্লেষণ করলেন; তা হচ্ছে মাটি, জল, বায়ু, ও তেজ। বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির বিষয়ে তিনি যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু এ জগতে নয় অন্যান্য গ্রহেও সুগতি দুর্গতি পরায়ন এ দুই শ্রেণীর প্রাণের অস্তিত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ্‌দের মন উন্মুক্ত এবং তাঁরা অন্যান্য গ্রহেও জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। স্রষ্টা না সৃষ্টি, বৃক্ষ আগে না বীজ আগে, জগত শাশ্বত না অশাশ্বত, আত্মা না অনাত্মা, এ সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বুদ্ধ চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং কার্য কারণ নীতি আবিষ্কার করলেন। তাঁর (বুদ্ধ) নবাবিষ্কৃত ধর্মে তিনি কোথাও সৃষ্টি কর্তার অবতারণা করেননি। কর্ম এবং কার্য কারণ নীতিকেই তিনি জন্মচক্র বলে অভিহিত করেছেন এবং তা' স্ব-স্ব জীবের স্ব-স্ব কর্মাধীন পরিচালিত হয়। জন্মের জন্য সর্ব প্রথমে তিনি অবিদ্যাকে দায়ী করেছেন কারণ অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, রোদন, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। জন্ম গ্রহণে দুঃখের সৃষ্টি এবং জন্ম রোধে দুঃখের নিবৃতি। এ জন্ম চক্র বা দ্বাদশ নিদান বা কার্য কারণ নীতি তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক পরিজ্ঞাত, প্রহীন, প্রত্যক্ষ এবং ভাবিত। যে কোন ব্যক্তি এটি গবেষণা, বিশ্লেষণ, পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তজ্জন্য তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধর্মে স্বাধীন এবং মুক্ত চিন্তার অবতারণা করেছেন।

প্রশ্নোত্তরে কার্য কারণ নীতি যথা সম্ভব সহজ সরল ভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পুস্তক লেখনীতে গ্রন্থকারের তেমন কোন কৃতিত্ব নেই। বৌদ্ধ মনীষাদের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তজ্জন্য এ বইয়ের কৃতিত্ব তাঁদের এবং তাঁদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। পুস্তকের ভুল ত্রুটির জন্য লেখক নিজেই দায়ী। শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ভুল ত্রুটি রোধে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তজ্জন্য তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পুস্তক পাঠে সম্মানিত পাঠক বর্গের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ও তাঁদের আন্তরিকতা সর্বতোভাবে কাম্য এবং পাঠকের যৎ সামান্য উপকার হলে লেখকের শ্রম এবং উদ্যম সার্থক মনে করব।

ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া
মায়ানী, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম।

অন্য দিকে না গিয়ে সোজা নীচের দিকে পড়ে? পরিশেষে তিনি আবিস্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে আপেল নীচের দিকে পড়ে। জগতে তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটুক বা না ঘটুক, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু জগতে ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। এটি জগতের কার্য্য কারণ নীতির চক্রাধীন। তথাগত বুদ্ধ জগতের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করে প্রতীত্য সমুৎপাদন নীতির উপদেশ প্রদান করে জন্ম মৃত্যুর আকারে ভাসমান জীবের জীবন দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তারমধ্যেও রয়েছে কার্য কারণ নীতি। এতে লীলাময়ের লীলা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কিংবা অদৃশ্য শক্তির দোহাই দিয়ে খেয়ালখুশীমত কোন অজুহাতের স্থান নেই। এখানে রয়েছে সুশৃঙ্খল নিয়ম নীতি। যা' একান্তভাবে যুক্তিতর্ক, পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রমাণযোগ্য। এখানে আত্মবিশ্বাসের কোন স্থান নেই এবং এটি আত্ম উপলব্ধির বিষয়। এ নীতিই বিশ্বে তথাগত বুদ্ধের অন্যতম অবদান। এ নীতিই বুদ্ধ ধর্মকে অন্য ধর্ম থেকে পৃথক করে রেখেছে। এ নীতিতে যাঁরা সামান্যতম ব্যবহারিক জ্ঞান ও লাভ করেছেন, তাঁরাই অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন বুদ্ধ ধর্মের অতুল্য মাহাত্ম্য। আর যাঁরা এ ধর্মের সাধনা লব্ধ পরমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বলার কি থাকতে পারে? কার্য্যকারণ শৃঙ্খলানীতি পর্য্যায়ক্রমের ব্যাখ্যা নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে দেখা যায় ঃ-

১। অনুলোম দেশনায় ঃ এটির বিদ্যমানতায় ঐটি ঘটে, এটির উৎপত্তি হেতুই ঐটির উৎপত্তি হয়।

২। প্রতিলোম দেশনায় ঃ এটির অবিদ্যমানতায় ঐটি ঘটে না, এটির নিরোধ হেতু ঐটি নিরুদ্ধ হয়।

৩। অনুলোম প্রতিলোম দেশনায় কেবলমাত্র উক্ত দুই নীতির সমন্বয় সাধন। 'উদান' গ্রন্থের 'বোধিসূত্তে' এ মূল নীতিটিকে উপরোক্ত তিন পর্য্যায়েই উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ নিখিল বিশ্বের সর্বব্যাপী প্রচলিত নিয়ম এ যে, বস্তুসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল হয়েই উপস্থিত হয় এবং কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন সত্তা নেই। এ অর্থে সমস্ত বস্তুই প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্বহীন। স্যার আইজ্যাক নিউটন যেমন আপেলের পতন দেখে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উদ্ভাবন করেছিরেন ঠিক তেমনি গৌতম বুদ্ধ সত্ত্বগণের ষড়ন্দ্রিয়, যথা– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনের মাধ্যমে রূপ,

শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম প্রভৃতি হতে ভব দুঃখের উৎপত্তি হয় উপলব্ধি করেছিলেন। জন্ম, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা, বেদনা, স্পর্শ, নাম রূপ, বিজ্ঞান ও সংস্কার প্রভৃতি জরা মরণের হেতু। অতীতে অমিতাভ বুদ্ধ একসময় কর্ম্মাকপ নামক নগরে অবস্থান করতেছিলেন, তখন তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু আনন্দের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, তৃষ্ণা বিজড়িত মানবগণ মুক্তিলাভের অসমর্থ হয়ে সংসারচক্রে বারংবার বিঘূর্ণিত হচ্ছে কুম্ভকারের চক্রের মত। তথাগত বুদ্ধ যে কার্যকারণ নীতি আবিস্কার করেছেন তা' হল– জন্ম হেতু জরা, ভব হেতু জন্ম, উপাদান হেতু-ভব, তৃষ্ণা হেতু উপাদান, বেদনা হেতু তৃষ্ণা, স্পর্শ হেতু বেদনা, ষড়ায়তন হেতু স্পর্শ, নামরূপ হেতু ষড়ায়তন, বিজ্ঞান হেতু নামরূপ, সংস্কার হেতু বিজ্ঞান, অবিদ্যা হেতু সংস্কার। অনুরূপভাবে অবিদ্যা হেতু সংস্কার, সংস্কার হেতু স্পর্শ, স্পর্শ হেতু বেদনা, বেদনা হেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হেতু উপাদান, উপাদান হেতু ভব, ভব হেতু জন্ম, জন্ম হেতু জরা-মরণ, জরা-মরণ হেতু শোক, পরিবেদন, দুঃখ দৌর্ম্মণস্যাদি বিবিধ অশান্তির উৎপত্তি। চিত্তের অকুশল চেতনাই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। বিরাগ সংযুক্ত মার্গ দ্বারা অবিদ্যার নিরবশেষ নিরোধে সংস্কারের নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে জন্মের নিরোধ এবং জন্মের নিরোধে জরামরণ শোক দুঃখ, উপায়াস ও দৌর্ম্মনস্যের নিরোধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখ রাশির নিরোধ হয়। সর্বজ্ঞানী গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, এ তত্ত্বের মধ্যে জগতের আদি খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয় কারণ এ নীতিতে ভগবান বুদ্ধ জগতের আদিতত্ত্ব পরিবেশন করেননি। তথাগত বুদ্ধ জগতের আদিতত্ত্ব অনুসন্ধানকে উন্মাদের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এ তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত কারো জানাই হয় না, জানতে পারেন না, পরিশেষে অনুতপ্ত অবস্থায় জীবনাবসন হয়। এ কার্যকারণ নীতি এক কথায় শুধু সত্ত্বগণের উৎপত্তি ও চ্যুতিতত্ত্ব না বরং এটা দুঃখ উৎপত্তিতত্ত্ব ও দুঃখ বিমুক্তিতত্ত্বও বটে।

প্রঃ কার্য্যকারণ নীতির কয়টি অঙ্গ?

উঃ- দ্বাদশ অঙ্গ।

প্রঃ দ্বাদশ অঙ্গের বিভক্তি কিরূপ?

উঃ	অতীত জন্ম	১। অবিদ্যা, (তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এসঙ্গে গৃহীত)।	অতীতের এ পঞ্চ হেতু বা কারণের বিদ্যমানতায় বর্তমান জন্মের উদ্ভব।
		২। সংস্কার।	
		প্রথম সন্ধি	
	বর্তমান জন্ম	৩। বিজ্ঞান	বর্তমানের
		৪। নামরূপ	পঞ্চফল
		৫। ষড়ায়তন	উৎপত্তি ভব
		৬। স্পর্শ	
		৭। বেদনা	
		দ্বিতীয় সন্ধি	
		৮। তৃষ্ণা	বর্তমানের ঐ
		৯। উপাদান	পঞ্চফল হতে
		১০। ভব (অবিদ্যা ও সংস্কার এর সঙ্গে গৃহীত)	(কর্ম ভব হতে) ভবিষ্যত জন্ম।
		তৃতীয় সন্ধি	
	ভবিষ্যৎ জন্ম	১১। জন্ম অর্থাৎ বর্তমান জন্মের (৩ -৭)	ভবিষ্যতের পঞ্চ কর্মফল (উৎপত্তি ভব)।
		১২। জরা, মরণ ইত্যাদি।	

প্রঃ অবিদ্যা বলতে কি বুঝায়?

উঃ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় অবিদ্যাকে মূল কারণরূপে দেখানো হয়েছে কিন্তু অস্থিত্বের মূলে অবিদ্যা নয়, অবিদ্যা থেকে জীব জগতের সৃষ্টি নয় এবং বিশ্ব প্রমাণ ব্যবস্থা তার ক্রিয়া নয়। অবিদ্যা একটি অবস্থা মাত্র, যা' অন্য আর একটি অবস্থার কারণে হয়। অবিদ্যার ধাতুগত অর্থ অজ্ঞানতা বা না জানা। জানার আকাঙ্খা মানুষের সহজাত ধর্ম। জন্ম লগ্ন থেকে চলছে জানার প্রয়াস। রহস্যের পর রহস্য অতিক্রম করে গ্রহ গ্রহান্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে জানার অভিযান। মানবের জানার ক্ষেত্র বহুদূর

বিস্তীর্ণ। মানুষ বাহিরের জগত সম্পর্কে জানার খুবই আগ্রহী, কিন্তু নিজেকে জানার চেষ্টা কোথায়? জীবনের মর্ম কোষে যে গভীর সত্য নিহিত আছে সে সম্বন্ধে তার ধারণাই নেই। যথাযথ ধারণার অভাবই অবিদ্যা। অবিদ্যার অন্ধকারে যার দৃষ্টি আচ্ছন্ন অর্থাৎ সত্যোপলব্ধি যার হয়নি, অনিত্য, দুঃখ পূর্ণ সংসার তার কাছে সুখেরইমনে হয়। অবিদ্যা কোন বিষয় বা বস্তুর যথার্থ স্বভাব জানতে দেয় না, বরং স্বরূপে বিপরীতবোদের সৃষ্টি করে। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এ ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের স্বরূপোলব্ধির অভাবই অবিদ্যা। ব্যয় ও ক্ষয় ধর্মশীলতা হেতু এরা যে দুঃখময় তা' না বুঝা অবিদ্যা। দুঃখের মূলীভূত কারণ যে তৃষ্ণা তা' না বুঝা অবিদ্যা, তৃষ্ণার উচ্ছেদে যে দুঃখের নিরোধ ঘটে, তা' না জানা অবিদ্যা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে দুঃখ নিরোধের উপায় তা' না জানা অবিদ্যা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিচয় বা ধর্ম সমূহ যে অসার ও অনাত্ম তা' না জানা অবিদ্যা। অন্ধকারের ন্যায় মোহ জগতের স্বরূপকে ঢেকে রাখে বলে মন সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। তাই কর্মের প্রকৃত স্বরূপ মানুষ বুঝতে পারে না। সূর্য্যালোকের আলোতে যখন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন সমস্ত বস্তু পরিস্কার ভাবে দেখা যায়, ঠিক তেমনি জ্ঞানালোকের দিব্য বিভায় মন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয় এবং তার কাছে জগতের প্রকৃত স্বরূপ আর গোপন থাকতে পারে না। অবিদ্যার মূলীভূত আসবগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

১। 'কাম' বা ইন্দ্রিয় পরায়ণতা,

২। 'ভব' বা সন্ততি মাধ্যমে বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং ৩। অবিদ্যা বা অহং জ্ঞান। প্রতি মুহূর্তে এদেহের মধ্যে ঘটছে রূপান্তর, একটি পরিবর্তনের অবিরাম স্রোতধারা, যার ফলে আমাদের স্থূল দৃষ্টিতেও প্রকট হয় শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে এবং পৌঢ়ত্ব থেকে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ থেকে বার্ধ্যক্যে রূপান্তর। এ পরিবর্তন ঠেকানোর কারো সাধ্য নেই। মন এবং মানসিক বৃত্তিসমূহ কি আমার শাসন মেনে অথবা আমার ইঙ্গিতে চলে? আমার ইচ্ছামত মনকে কি আমি চালাতে পারি? মন কত কল্পনার জাল বুনছে প্রতিনিয়ত। তার কতটুকু আমি জানি। মুহূর্তে মুহূর্তে কত চিন্তার, কত ভাবের উদয় হচ্ছে মনে তার কতটুকু টের পাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তি জানে না দুঃখ, দুঃখের উদয়, দুঃখের নিরোধ অবসান এবং দুঃখ নিরোধের পথ অর্থাৎ এ চার

আর্য সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অবিদ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টি পায়না আর্য সত্যের সন্ধান। এক কথায় অজ্ঞতাই অবিদ্যা অর্থাৎ দেহমনে যখন যা' উৎপন্ন হয় তা' না জানাই অবিদ্যা এবং বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ না জানাই অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে সংস্কার উৎপন্ন হয়, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ হয়।

প্রঃ সংস্কার কি?

উঃ কার্যকারণ শৃঙ্খলায় সংস্কার মানে চেতনা। "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি" অর্থাৎ চেতনাই কর্ম। বস্তুতঃ চেতনা কর্মে রূপান্তরিত হয়। সচেতন চেষ্টা ছাড়া কর্মের অনুধাবন হয় না। অতএব প্রতি কর্মের মূলে রয়েছে কর্ম সম্পাদনের চেতনা। কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা যা' সংস্কৃত বা নিত্য সম্পাদ্যরূপে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তা'ই সংস্কার।

প্রঃ অবিদ্যা বা অজ্ঞতা কিভাবে সংস্কার সৃষ্টি করে?

উঃ মনে সঞ্চিত পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার ছাপ বা কর্মস্রোত বা কর্মপ্রবাহ বা সংস্কার সমূহ আমাদের অতীত অতীত অবিদ্যা বা অজ্ঞতা প্রসূত। এ অবিদ্যা বা অজ্ঞতা অন্ধকারের ন্যায় বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃত চিত্র ঢেকে রাখে। বস্তু বা ব্যক্তি মাত্রেই অনিত্যতা, দুঃখের সর্বব্যাপীতা ও অনাত্মতা। সংস্কারের এ ত্রিলক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুন আমরা বস্তু সমূহকে শাশ্বত, অজড়, অমর বলে ধারণা করি, সুখের কল্পনা করি এবং এর পেছনে ধাওয়া করি। আমরা মনে করতেপারি না যে, এ কাল্পনিক সুখের পেছনে ধাওয়া বা সংগ্রাম মাত্রই দুঃখাবহ। আমাদের ইচ্ছা, অভিপ্রায় ক্ষোভ অভিমানের তৃপ্তার্থে আমরা আত্মবাদের শরণাপন্ন হই। মোহবশে সুখের ধারনা এবং আত্মাভিমান শাশ্বতবাদ থেকেই উৎপন্ন। অতএব কোন বস্তু শাশ্বত এবং অপরিবর্তনশীল বলে ধারনা করাই প্রকৃত অবিদ্যা। সত্যিকার দার্শনিক সুক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে গেলে, কোন বস্তুই পরপর দুই মুহূর্তের জন্যও এক থাকেনা অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে। এ দেহ মন মুহূর্তের জন্যও স্থির বা নিস্ক্রিয় নয়। বিরতিহীনভাবে দেহমন ক্রিয়া করেই চলেছে। এটি একটি গভীর চিন্তা, বিশ্লেষণ, পর্য্যবেক্ষণ এবং অনুভাবন। বাহ্য দৃষ্টিতে এক মনে হলেও বস্তু বা ব্যক্তি মাত্রই তাদের নিজ নিজ ভঙ্গিতে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর এ পরিবর্তন ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অণু পরমাণুতে। এটা স্থুল দৃষ্টান্তে সাধারণের বোধগম্য হবে যে সকাল বেলার 'আমি' ও বিকাল বেলার 'আমি'তে

আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও এরা এক নহে। সকাল বেলার 'আমি' ছিলাম অস্নাত, অভুক্ত, স্বল্পাভুক্ত ও স্বল্প জ্ঞান বিশিষ্ট। আর বিকাল বেলার 'আমি' স্নাত, ভুক্ত, অধিকতর অভিজ্ঞ ও জ্ঞান সম্পন্ন ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি সকাল বেলার আমি ও বিকাল বেলার আমি কে বাহ্য দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন বলেই মনে হয়। একজন মানুষের জীবন জন্ম থেকেমৃত্যু পর্যন্ত পর্য্যালোচনা করলেই আমরা প্রতিটি ধাপে ধাপে মানুষের দেহ মনের পরিবর্তনশীলতা, অনিত্যতা এবং জীবন সংগ্রামে দুঃখময়তা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অনুধাবন করতে পারি।

সকালে প্রস্ফুটিত একটা ফুলের সৌন্দর্য্য এবং সন্ধ্যায় ঐটির মলিনতা বা সৌন্দর্যহীনতা পর্যালোচনা করলেই আমরা অনিত্যতা ও পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারি, তথাপি মোহবশে বিভ্রান্তি আমাদের পেয়ে বসে এবং জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে, ফলে পরিবর্তনের এ সার্বজনীন রীতির কথা বিস্মৃত হয়ে আমরা নিজেদেরই মত অনিত্য ও অসার জিনিষের পেছনে ধাওয়া করেও ওটা লাভের জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পতঙ্গের অগ্নিশিখায় আলিঙ্গণের মত সীমাহীন দুঃখকে বরণ করি ও নতুন নতুন সংস্কার উৎপত্তির ফলে বার বার পুনঃ জন্মের অধীন হই। অবিদ্যা বা অজ্ঞতা হল সম্যক জ্ঞানহীনতা যা বিভ্রান্তির জন্য কর্মের মাধ্যমে সংস্কারের উৎপত্তি ঘটায়। অবিদ্যা সংস্কারকে জাগিয়ে তোলে তাই বলা হয়েছে অবিদ্যার কারণে সংস্কার। কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিকতাকে সংস্কার বলা হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবনে যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় চিন্তা করে, বাক্য বলে কিংবা কার্য করে তখন সে চিন্তা বাক্য বা কার্য একনতুন ভাবের সৃষ্টি করে। চিত্তের এ নতুন ভাব বা চেতনাই সংস্কার। এ সংস্কার হল পুনর্জন্ম প্রদানকারী চেতনা। এর অপর নাম কর্ম।

প্রঃ সংস্কার কত প্রকার ও কি কি?

উঃ তিন প্রকার। যথা–

১। কুশল সংস্কার।

২। অকুশল সংস্কার ও

৩। অরূপ সংস্কার বা আনেঞ্জা সংস্কার।

প্রঃ কুশল সংস্কার বলতে কি বুঝায়?

উঃ অবিদ্যা বর্জনীয় মনে করে কেহ যদি কামলোকের কুশল, রূপলোকের

কুশল উৎপন্ন করে তবে তার কুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। অবিদ্যার লক্ষণ, কার্য-কারণ গভীরভাবে মনোনিবেশ করে তার প্রভাব মুক্ত হওয়ার চেষ্টাতেও কুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। পুণ্য চেতনায় যে কর্ম সম্পাদিত হয়, তাকে বলা হয় কুশল বা পূণ্য কর্ম। মনে যখন পুণ্য চেতনার উদয় হয়, মন তখন ভক্তি প্রীতি প্রেম ইত্যাদি শুভ্রভাবে পূর্ণ থাকে। এ চেতনায় অনুষ্ঠিত কর্ম অনাবিলতার জন্য হয় সুন্দর সুশোভন। এজন্য একে বলে কুশল বা পুণ্য কর্ম। দান, শীল, ভাবনা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রঃ অকুশল সংস্কার কাকে বলে?

উঃ অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তে লোভ, দ্বেষ-মোহ মুলক কর্ম সম্পাদন করলে অপুণ্য সংস্কার বা অকুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। অপুণ্য চেতনা কামক্রোধাদি আবিলভাব লিপ্ত পাপবিদ্ধ। অপুণ্য চেতনা কলঙ্কিত কর্মকে বলা হয় অকুশল বা পাপ কর্ম। প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, চার প্রকার বাক্য দোষ এবং লোভ, দ্বেষ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রঃ অরূপ সংস্কার বা অনেঞ্জা সংস্কার বা কুশল ও নয় এবং অকুশল ও নয় এরূপ সংস্কার বলতে কি বুঝায়?

উঃ চার অরূপ ধ্যান স্তরের সাধনাই অরূপ চেতনা। অরূপ চেতনাকে অনেঞ্জা সংস্কার বলা হয়। চার আনেঞ্জা স্থির দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের কারণ চার অরূপচিত্ত (অরূপ কুশল চিত্ত) উৎপন্ন হয়। অবিমুক্ত মানুষ পুণ্য, অপুণ্য, স্থির দীর্ঘস্থায়ী এরূপ সংস্কারমুক্ত।

প্রঃ কর্মের স্বভাব কিরূপ?

উঃ কর্মের অনুষ্ঠান শুধু অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয় না। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। কর্ম ফল দান করবেই। ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করলে তার ফল হয় তেমনি কর্ম অনুষ্ঠিত হলে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য সুকর্মের ফল সুখপ্রদ এবং দুষ্কর্মের ফল দুঃখপ্রদ অর্থাৎ জীব সুকর্মের ফলে জন্ম জন্মান্তরে সুগতি লাভ করে এবং দুষ্কর্মের ফলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। এক কথায় বলতে গেলে কর্ম জীবত্বের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে জীবত্বের প্রবাহকে চালিত করে। এজন্য কর্মকে বলা হয় ভববীজ। সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়।

প্রঃ বিজ্ঞান কি?

উঃ আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে বিজ্ঞান কথাটি ব্যবহার করি, সে অর্থ এখানে

প্রযোজ্য নয়। 'বিজনাতীতি বিঞ্ঞানং, চিন্তেতীতি চিত্তং' অর্থাৎ বিজানন শক্তি আছে বলিয়া বিজ্ঞান, জানা অর্থে বিজ্ঞান এবং চিন্তা করিবার শক্তি আছে বলে চিত্ত এবং মনন করার শক্তি আছে বলে মন বলা হয়। এ অর্থ সংকীর্ণ, ব্যাপক নয়, তবে বিজ্ঞান এবং চিত্ত মনের প্রতিশব্দ। সুতরাং বিজ্ঞান বলতে মনকেই বোঝায় আবার চেতনাকেও বিজ্ঞান বলা হয়। সংস্কার বশে চক্ষুর সঙ্গে রূপের, কর্ণের সঙ্গে শব্দের, নাসিকার সঙ্গে গন্ধের, জিহ্বার সঙ্গে রসের, কায়ের সঙ্গে স্পৃশ্যের, চিত্তের সঙ্গে ভাব বা ধর্মের যে সম্মিলন হয় তখন তা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এ বিকাশ অবস্থাই বিজ্ঞান। এটি চিত্তের সংস্কার শক্তির ফলাবস্থা বা বিপাকজ্ঞান। এ বিপাকজ্ঞান কোন কারণে সক্রিয় হলে চিত্তপথে নূতন সংস্কার উৎপন্ন করে। উদ্ভিদ যেমন বীজ ও বৃক্ষ, বৃক্ষ ও বীজ আকারে আবর্তিত হয়ে চলে, জীবজগত ও সংস্কার ও বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান ও সংস্কারে আবর্তিত হয়ে চলছে। কার্যকারণ শৃঙ্খলায় যে বিজ্ঞান বা মনের উল্লেখ আছে, তা' হচ্ছে প্রতিসন্ধি চিত্ত।

প্রঃ প্রতিসন্ধি চিত্ত কাকে বলে?

উঃ কালের অনন্ত বিস্তারে যখন জীবের জীবত্বের লীলা চলে অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ চলতে থাকে, তখন সংস্কার রূপ কর্মবীজের অঙ্কুরণে মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী নতুন জন্মলগ্নে যে চিত্তের উদয় হয়, তাকে বলা হয় প্রতিসন্ধি চিত্ত। মৃত্যু ও নব জন্মের সন্ধিক্ষণে দুই ভবের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করে বলে তা' প্রতিসন্ধি চিত্ত নামে অভিহিত। জীবন প্রবাহে প্রতিসন্ধি চিত্ত তার উৎস।

প্রঃ ভবাঙ্গ চিত্ত কি?

উঃ প্রতিসন্ধির পরে যে চিত্ত চলতে থাকে তা'কে ভবাঙ্গ চিত্ত বলে অর্থাৎ প্রতিসন্ধি চিত্তের পরেই ভবাঙ্গ প্রবাহ বা ভবাঙ্গ চিত্ত যা চলতে থাকে আজীবন। একে মনের অবচেতন স্তর বলা হয়।

প্রঃ চ্যুতি চিত্ত বলতে কি বুঝায়?

উঃ মৃত্যুকালে যে চিত্ত একটি জন্মের উপর যবনিকা টেনে চ্যুতি ঘটায় তাকে বলা হয় চ্যুতি চিত্ত।

প্রঃ প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তগুলির মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

উঃ নদীর উৎসের সঙ্গে নদীর ও তার মোহনার যে সম্পর্ক; প্রতিসন্ধির সঙ্গে ভবাঙ্গ ও চ্যুতির সম্পর্কও তা'। নদীর প্রবাহে তার উৎস, মধ্যভাগ ও

মোহনার যেমন সম্বন্ধযুক্ত ভবাঙ্গ ও চ্যুতি চিত্তগুলি ও আদি, মধ্য ও অবসানরূপে সম্বন্ধযুক্ত। একটি জন্মের কালসীমার মধ্যে এ তিনটি স্তর যথাক্রমে আদি, মধ্য ও অবসান রূপে চিহ্নিত। বলা বাহুল্য, এখানে বিজ্ঞান আদি বলে উক্ত প্রতিসন্ধি চিত্ত। বিজ্ঞানের কারণে নাম রূপের উৎপত্তি এবং বিজ্ঞানের নিরোধে, নামরূপের নিরোধ হয়।

প্রঃ নামরূপ কাকে বলে?

উঃ নাম বলতে সত্ত্বার সূক্ষ্ম বা মানসিক অংশ এবং রূপ বলতে স্থূল বা কায়িক অংশ বুঝায়। নামরূপ বুদ্ধদর্শনের একটি অত্যাবশ্যকীয় নীতি। অর্থাৎ দেহ ও মনকে পৃথক এবং স্বতন্ত্রভাবে বিচার না করে একই বস্তুর দুটো দিক রূপে গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান বা সাধারণ চেতনাকে আত্মসচেতন হতে হলে তার রূপ বা বাহনের প্রয়োজন, যার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে এবং আত্ম প্রকাশ করবে। এরূপে 'নাম' বা চিত্ত চৈতসিকসম্পন্ন সূক্ষ্ম চেতনা বত্রিশটি অংশ সমন্বিত রূপ বা দেহের সীমায় নিজেকে সীমিত করে রাখে। মন ছাড়া দেহ যেমন অচেতন পদার্থমাত্র তেমন দেহ ছাড়া মনেরও ঠাঁই নেই উভয়ে পরস্পরাশ্রিত। মনের উদয় হলে দেহ গৃহ রচনা স্বতঃসিদ্ধ। তাই কার্যকারণ শৃঙ্খলায় আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের উদয়ে নামরূপের উদয়। সহজ কথায় বলতে গেলে 'নাম' হচ্ছে মানসিক দেহ এবং 'রূপ' হচ্ছে ভৌতিক দেহ। বস্তুতঃ সংসারে এমন কোন বস্তুর কল্পনা করা যায় না যার নামও নেই, রূপও নেই, সুতরাং ইন্দ্রিয় নিচয় ও তাদের গ্রাহ্য বিষয় সমূহও এ নাম-রূপেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রঃ নামরূপ গঠনে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি?

উঃ নাম এবং রূপ সমন্বিত বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি আমাদের বিজ্ঞান বা চেতনা না থাকে তাহলে নাম-রূপ ও আমাদের কাছে অর্থহীন। যেমন 'বুদ্ধ' এ নাম বা উপাধি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন, যদি না আমরা জানি বুদ্ধ কে বা কি ছিলেন, তিনি কি করতেন, কিভাবে জীবন ধারণ করতেন, কোথায় বিচরণ করতে ইত্যাদি। অনুরূপভাবে পানির অপর নাম 'জীবন' কিন্তু এ পানিও আবার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যদি না আমরা জানি কিরূপ পানি পান করতেহবে, বিশুদ্ধ পানি দূষিত পানি বা এদের প্রকৃতি। সুতরাং বিজ্ঞান বা চেতনা ব্যতীত নাম-রূপ আমাদের কাছে অর্থহীন, ফাঁকা অর্থাৎ নাম-রূপ আমাদের বিজ্ঞান বা চেতনার উপর নির্ভরশীল।

প্রঃ বিজ্ঞান কিসের উপর নির্ভরশীল?

উঃ বিজ্ঞান বা চেতনা আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার চাপ বা কর্ম প্রবাহের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ছাপগুলি বা প্রবাহ বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারনা বা চেতনাই লোপ পায়। সুতরাং বিজ্ঞানও আমাদের মনের এ ছাপ বা সংস্কার বা কর্মপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল।

প্রঃ মানসিক দেহের গঠন প্রণালী কিরূপ?

উঃ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে মানসিক দেহ গঠিত।

প্রঃ রূপের গঠন কিরূপ ?

উঃ চার মহাভূত এবং এদের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ।

প্রঃ চার মহাভূত কি কি?

উঃ মাটি, জল, বায়ু এবং তেজ। এ চারটিকে চার মহাভূত বলা হয়।

প্রঃ চার মহাভূত এর সমন্বয়ে উৎপন্ন অন্যান্য রূপগুলি কি কি?

উঃ ১। ইন্দ্রিয়রূপ (প্রসাদরূপ)– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায়।

২। বিষয় রূপ (গোচররূপ) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পৃশ্য।

৩। ভাব রূপ– স্ত্রীভাব ও পুঃভাব।

৪। হৃদয় রূপ– হৃৎপিণ্ড।

৫। জীবন রূপ- জীবনীশক্তি।

৬। আহার রূপ- আহার বা পরিপুষ্ট।

৭। সীমা রূপ বা পরিচ্ছেদ রূপ– আকাশ।

৮। বিজ্ঞপ্তি রূপ- কায় বিজ্ঞপ্তি ও বাক বিজ্ঞপ্তি।

৯। বিকার রূপ– লঘুতা, মৃদুতা ও নমনীয়তা।

১০। লক্ষণ রূপ- উপচয়, অবস্থিতি, জরা ও বিলয়।

প্রঃ রূপের ধর্ম সমূহ কি কি?

উঃ কঠিনত্ব, প্রবন্ধন শক্তি, তাপ ও প্রকম্প।

ক) ক্ষিতি বা পঠবী বা মাটির গুণ হল কঠিনত্ব।

খ) অপ বা জলের গুণ হল প্রবন্ধন।

গ) তেজ এর গুণ হল তাপ, জ্বর সৃষ্টি এবং

ঘ) মরুৎ বা বায়ুর গুণ হল প্রকম্পন।

রূপের উপাদান গুলো প্রবন্ধিত হয় অপ দ্বারা, যাকে স্পর্শ করা যায় না।

প্রঃ অকুশল বিপাক চিত্ত কোথায় জন্ম গ্রহণ করায়?

উঃ দূর্গতি ভূমিতে যথা, নরক, অসুর, তির্যক ও প্রেতলোকে।

প্রঃ কামাবচর কুশল বিপাক চিত্ত কোথায় জন্ম গ্রহণ করায়?

উঃ কাম সুগতি ভূমিতে যথা মনুষ্য ও ছয় দেবলোকে।

প্রঃ রূপ বিপাক চিত্ত কোথায় উৎপন্ন হয়?

উঃ রূপলোকে অর্থাৎ ষোল রূপ ব্রহ্মলোকে।

প্রঃ অরূপ বিপাক চিত্ত কোথায় উৎপন্ন হয়?

উঃ অরূপ লোকে অর্থাৎ চার অরূপ-ব্রহ্ম লোকে।

প্রঃ নাম ও রূপ পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

উঃ নাম রূপ শব্দটি যুগ্ম ও পরস্পর আশ্রিত। একের অবিদ্যমানে অন্যটি চলতে পারে না। যেমন নৌকা ও মাঝি। মানবের সাহায্যে নৌকা যেমন সাগরে পরিচালিত হয়, সেরূপ "নামের" সাহায্যে রূপকার্য চালিত হয় অর্থাৎ মানুষ ও নৌকা পরস্পরকে আশ্রয় করে জলপথে গমন করে; তেমন "নাম" ও "রূপ" পরস্পরের আশ্রয়ে ভব সংসার চালিত হয়।

প্রঃ নাম রূপের গঠিত মানবের দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিরূপ জীবন যাপন করা উচিত?

উঃ উল্লেখিত প্রশ্নোত্তোরে নাম এবং রূপকে নৌকা ও মাঝির সাথে তুলনা করা হয়েছে। দেহ ও মন দুইটি ভিন্ন জিনিষ, এক সাথে থাকে কিন্তু এক না, একটি না হলে অন্যটি চলতে পারে না। নৌকা ও মাঝি বিদ্যমান থাকলে সুন্দরভাবে নদনদী বা সাগর মহাসাগর অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। তজ্জন্য প্রয়োজন "বৈঠার"। "বৈঠা" থাকলে মাঝি সুন্দরভাবে যেদিকে খুশী সেদিকে নৌকাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে যেতে পারবে এবং গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারবে। বৈঠা না থাকলে মাঝির পক্ষে নৌকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হবে, ফলে যে কোন মুহুর্তে বিপদের সম্ভাবনা যেমন থাকে তেমনি গন্তব্যস্থানে পৌছাও দুঃস্কর হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে দেহ ও মনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য "স্মৃতি" থাকা একান্ত অপরিহার্য। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করে সদা সর্বদা স্মৃতিতে বিদ্যমান থাকে তার পক্ষে দুঃখ সাগর উত্তীর্ণ হওয়া খুবই সহজ। "স্মৃতি" বিহীন মানবের জীবন বৈঠাহীন মাঝির সমতুল্য। বৈঠার মাধ্যমে মাঝি যেমন নৌকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে ঠিক তেমনি স্মৃতিবান লোকও দেহমনকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে মহৎ জীবন গঠনে সাহায্য করে। অতএব দশ

সুচরিত শীল বিশুদ্ধভাবে পালন করে সদা সর্বদা স্মৃতি অনুসরণ করে জীবনযাপন দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব নহে।

প্রঃ বেদনা কাকে বলে?

উঃ বেদনা হচ্ছে অনুভূতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এ ছয় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের রসানুভূতিই বেদনা।

প্রঃ বেদনা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ নয় প্রকার। যথা–

১। সুখ বেদনা, ২। দুঃখ বেদনা, ৩। উপেক্ষা বেদনা, ৪। সামিষ সুখ বেদনা, ৫। নিরামিষ সুখ বেদনা, ৬। সামিষ দুঃখ বেদনা, ৭। নিরামিষ দুঃখ বেদনা, ৮। সামিষ উপেক্ষা বেদনা ও ৯। নিরামিষ উপেক্ষা বেদনা।

সংক্ষেপে পাঁচ প্রকারের বেদনা যথা–

১। সুখ বেদনা, ২। দুঃখ বেদনা, ৩। উপেক্ষা বা সাম্য বেদনা, ৪। সৌমনস্য বেদনা ও ৫। দৌর্মনস্য বেদনা।

প্রঃ সংজ্ঞা বলতে কি বুঝায়?

উঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয় সম্বন্ধে প্রথম প্রতীতি বা উপলব্ধিকেই সংজ্ঞা বোঝায়। এর দ্বারা গোচরীভূত বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় মাত্রই হয় এবং বিষয়ান্তরের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়।

প্রঃ সংস্কার কি?

উঃ সংস্কার হচ্ছে মনোবৃত্তি সমূহ। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, ঈর্ষা, মাৎসর্য ইত্যাদি অকুশল বা পাপ মনোবৃত্তি এবং অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, শ্রদ্ধা, প্রীতি, করুণা ইত্যাদি কুশল বা পুণ্য মনোবৃত্তি।

প্রঃ নাম রূপের কারণে কিসের উৎপত্তি হয়?

উঃ নাম রূপের কারণে ষড়ায়তন উৎপন্ন হয়।

প্রঃ নাম রূপের নিরোধে কিসের নিরোধ হয়?

উঃ ষড়ায়তন নিরোধ হয়।

প্রঃ ষড়ায়তন বলতে কি বুঝায়?

উঃ ষড়ায়তন বলতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনকে বুঝায়। নাম রূপ বা চেতনা ও তার বাহন দেহ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাজ করার জন্য ছয় আয়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।

ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই প্রধান। মনের সাহায্য ছাড়া "ব্যক্তিই" অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। এছয় ইন্দ্রিয় দ্বারকে বলা হয় ছয় আয়তন। ছয় আয়তন হচ্ছে যথা–

১। চক্ষু আয়তন, ২। স্রোতায়তন, ৩। ঘ্রাণায়তন, ৪। জিহ্বায়তন, ৫। কায়ায়তন ও ৬। মনায়তন।

আয়তন অর্থে উৎপত্তিস্থল বা উৎপত্তি ভূমি বোঝায়। চক্ষু ইন্দ্রিয় ও দৃশ্যমান রূপের সংযোগে যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাকে বলে চক্ষু বিজ্ঞান। শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও শব্দ সংযোগে যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাকে বলে স্রোত্র বিজ্ঞান, অনুরূপভাবে কায় বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান।

প্রঃ ষড়ায়তন কিভাবে উৎপন্ন হয় এবং এদের কাজ কি?

উঃ দেহমন থাকলে ষড়ায়তন হবেই। কারণ দেহ মন তাদের কাজ করার জন্য ষড়ায়তন অবশ্যই প্রয়োজন। ষড়ায়তন ছাড়া দেহমনের ক্রিয়া অচল। যেমন- চক্ষু না থাকলে দৃশ্যমান বস্তুর সংস্পর্শে না আসলে কোন ক্রিয়া হবে না। কর্ণ না থাকলে দৃশ্যমান বস্তুর সংস্পর্শে না আসলে কোন ক্রিয়া হবে না। অনুরূপভাবে নাসিকা, জিহ্বা, কায় এবং মন এদের অনুপস্থিতিতে গ্রাহ্য বিষয় সমূহের স্পর্শের কোন ক্রিয়া হতে পারে না। দেহমন থাকলে তাকে কর্ম করতে হবে। আর কর্ম করতে গেলে ষড়ায়তন ব্যবহার করতে হবে। ষড়ায়তন ছাড়া স্পর্শ হবে না। স্পর্শ না হলে বেদনা বা অনুভূতি হবে না। এভাবে পরবর্তী কার্য্য কারণে বাধা হবে। ষড়ায়তনের কাজ হল স্পর্শ উৎপন্ন করা।

প্রঃ ষড়ায়তনের কারণে কি উৎপন্ন হয়?

উঃ স্পর্শ।

প্রঃ ষড়ায়তনের নিরোধে কিসের নিরোধ হয়?

উঃ স্পর্শের নিরোধ হয়।

প্রঃ স্পর্শ বলতে কি বুঝায়?

উঃ স্পর্শ বলতে বোঝায় সংযোগ বা মিলন। ষড়েন্দ্রিয়গুলি তাদের স্ব স্ব কার্য্য করতে হলে অবশ্যই তাকে বস্তুর সংশ্রবে আসতে হবে। অতএব স্পর্শের উৎপত্তি ঘটায়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগই অভিপ্রেত। এ স্পর্শের দ্বারা ঘটনা সমূহের অভিজ্ঞতার সঠিক ছাপ গ্রহণে ও অবশেষে সংশ্লিষ্ট বস্তু সমূহের পরিচিতি লাভে সাহায্য করে। স্পর্শ ছাড়া বস্তুর

সঠিক ধারনা করা ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। চক্ষু আয়তন আছে বলেই রূপের সঙ্গে তার স্পর্শ হয়। শ্রোত্রায়তন আছে বলেই শব্দের সঙ্গে তার স্পর্শ হয়। তেমনি অন্যান্য আয়তনগুলির সাথেও স্পর্শের সৃষ্টি করে।

প্রঃ স্পর্শ কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ নাম রূপ বা দেহ মনে ষড়ায়তন বিদ্যমান। ষড়ায়তন হচ্ছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন। আমাদের জীবন প্রবাহে বা চলার পথে যে সমস্ত বস্তু পড়ে তাদের স্ব স্ব কার্য্যের প্রকৃতি এ ষড়ইন্দ্রিয়ের সাথে সংঘর্ষ হবেই। এটি স্বাভাবিক। যেমন চক্ষু আছে দৃশ্যমান বস্তুও আছে। এ চক্ষুর কাজ হচ্ছে দেখা। যতক্ষণ দৃষ্টিশক্তি থাকবে ততক্ষণ আমরা বাহ্যিক রূপ দেখি। কিভাবে দেখি? চক্ষুর সাথে বাহ্যিক বস্তুর রূপ সংস্পর্শ হয় বলেই আমরা বস্তু দেখি এবং বস্তুর স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করতে পারি। কর্ণ আছে শব্দও আছে। দুইটি আলাদা জিনিষ। কর্ণের পর্দার সাথে যখন শব্দের স্পন্দনের সংঘাত হয় তখন শব্দ শুনি এবং শব্দের প্রকৃতি সম্পর্কেও অবহিত হতে পারি। জিহ্বার ও রসাস্বাদন দুইটি আলাদা জিনিষ কিন্তু যখন জিহ্বার সহিত রসাস্বাদনের সংস্পর্শ হয় তখন এর স্বরূপ বা প্রকৃতি বুঝতে পারি। অনুরূপভাবে নাসিকার সাথে ঘ্রাণের, কায়ের সাথে স্পর্শের এবং মনের সাথে ধর্মের সংঘাত বা সংঘর্ষ হয় তখন এদের স্ব স্ব প্রকৃতি বুঝা যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিচয় ও তাদের গ্রাহ্য বিষয় সমূহের সংঘাত বা সংঘর্ষের ফলেই স্পর্শ উৎপন্ন হয়। ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয় এবং তাদের গ্রাহ্য বিষয় সমূহের অথবা যে কোন একটির অভাবে বা অকার্যকর হলে সংযোগ কার্যকর হতে পারে না। এক কথায় ইন্দ্রিয় সমূহ এবং তাদের গ্রাহ্য বিষয় সমূহের সংঘাত বা সংঘর্ষের নামই স্পর্শ।

প্রঃ ইন্দ্রানুযায়ী তাদের শ্রেণী বিভাগ কি কি?

উঃ ছয়টি, যথা -

১। চক্ষু সংস্পর্শ, ২। শ্রোত্র সংস্পর্শ

৩। ঘ্রাণ সংস্পর্শ ৪। জিহ্বা সংস্পর্শ।

৫। কায় সংস্পর্শ ও ৫। মন সংস্পর্শ।

উল্লেখিত সংযোগ শুধু সংযোগে পর্যবসিত হয় না তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যাম্ভাবী। বুদ্ধ বলেছেন– আমাদের স্বাভাবিক মন নির্মল, ভাস্বর। বাইরের উপক্লেশ সমূহ বা মালিন্য তাকে ক্লিষ্ট করে মলিন করে।

প্রঃ চিত্ত কিভাবে কলুষিত হয়?

উঃ অশুদ্ধ মলিন সংস্কার প্রভাব সমূহ চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চিত্তকে কলঙ্কিত করে যখন বিষয়ের স্পর্শ বা সংযোগ হয়। অন্যথা চিত্ত কলুষিত হতে পারে না। এখানে কামক্রোধ উদ্রেককারী বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।

প্রঃ স্পর্শ সম্ভব হয় কি কারণে?

উঃ ছয় আয়তন থাকার জন্য। ছয় আয়তন না থাকলে স্পর্শ সম্ভব হতো না।

প্রঃ স্পর্শের কারণে কিসের উৎপত্তি হয়?

উঃ বেদনার।

প্রঃ স্পর্শের কারণে কিসের নিরোধ হয়?

উঃ বেদনার নিরোধ।

প্রঃ বেদনা বলতে কি বুঝায়?

উঃ বেদনা হচ্ছে অনুভূতি। বিষয় বা আলম্বন যখন ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় তখন স্পর্শের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আর এ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আলম্বনের বা বিষয়ের রসানুভূতি। অরণি সংস্পর্শে যেমন আগুণ জ্বলে উঠে, তেমনি ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শে এ রসানুভূতি। এ অনুভূতিকে বলা হয় বেদনা। এ অনুভূতি বা বেদনা সর্বদা স্বাদযুক্ত বা রুচিকর নয় বিষাদযুক্ত বা অরুচিপূর্ণও হয়। আবার স্বাদ বিষাদহীনও হয়।

প্রঃ বেদনা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ বেদনা বা অনুভূতি স্পর্শজাত অর্থাৎ স্পর্শের কারণে বেদনার উৎপন্ন হয়। আমাদের জীবন যাত্রার চলার পথে যে সমস্ত বস্তু পড়ে তাদের সাথে আমাদের ইন্দ্রিয় নিচয়ের যে কোনটির সংস্পর্শ না ঘটা পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না এটি আমাদের কিরূপ অনুভূতি বা বেদনার সৃষ্টি করে। যেমন– সুখ, দুঃখ এবং সুখও নহে এবং দুঃখও নহে বা উপেক্ষা। ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয় বা তাদের গ্রাহ্য বিষয় সমূহের সংযোগই উৎপত্তি ঘটে। এ দুইয়ের যে কোন একটির অবিদ্যমানতায় স্পর্শের উৎপাদন অসম্ভব। জিহ্বা এবং স্বাদ গ্রহণযোগ্য বস্তু এ দুইটির যে কোন একটির অবিদ্যমানে স্পর্শের অভাবেস্বাদ গ্রহণ সম্ভব হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় নিচয় ও তাদের গ্রাহ্য বিষয় সমূহের সংঘাতের নামই স্পর্শ। আর স্পর্শ হলেই বেদনার অনুভূতি হবে এবং এটা স্বাভাবিক।

প্রঃ সহজভাবে বুঝার জন্য বেদনাকে কয়ভাবে বিভক্ত হয়েছে ও কি কি?

উঃ পাঁচ ভাগে, যথাঃ-

১। সুখ বেদনা, ২। দুঃখ বেদনা ৩। উপেক্ষা বেদনা ৪। সৌমনস্য বেদনা ও ৫। দৌর্মনস্য বেদনা।

প্রঃ সুখ বেদনা কি?

উঃ স্বাদযুক্ত বা মনের অনুকূল অনুভূতিকে বলা হয় সুখ বেদনা।

প্রঃ দুঃখ বেদনা কি?

উঃ সুখ বেদনার বিপরীত অনুভূতি দুঃখ বেদনা।

প্রঃ উপেক্ষা বেদনা কি?

উঃ যে অনুভূতি সুখেরও নয় দুঃখেরও নয় তাকে বলা হয় উপেক্ষা বেদনা বা সুখ' দুঃখ হীন অনুভূতি। এতে সুখের যেমন লেশমাত্র নেই তেমনি দুঃখের অংশ ও নেই। তা' সাম্যে অবস্থিত অর্থাৎ এতে সুখ দুঃখ অনুভূতির অভাব।

প্রঃ উপেক্ষা বেদনা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উঃ ভাবনার মাধ্যমে যোগী মনের এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়। সুখ-দুঃখকে সমভাবে গ্রহণ করে যোগী মনের সাম্যাবস্থিতি একটি উন্নত অবস্থা। এ ধরণের মন সুখে চঞ্চল হয়না, দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে না অর্থাৎ সাম্যে অবস্থিত হয়। এ সাম্যের সঙ্গে সাধারণ উপেক্ষা বেদনার তুলনা চলে না।

প্রঃ সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য অনুভূতি কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উঃ আবেগে মিশ্রিত সুখ ও দুঃখ মানসিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রঃ সৌমনস্য কি?

উঃ মানসিক আনন্দ অনুভূতি।

প্রঃ দৌর্মনস্য কি?

উঃ মানসিক দুঃখ অনুভূতি।

প্রঃ তৃষ্ণা কিভাবে উৎপন্ন হয়।

উঃ তৃষ্ণা বা বাসনা বেদনা বা অনুভূতি থেকেউৎপন্ন হয়। বেদনা বা অনুভূতি ব্যতীত তৃষ্ণার উৎপত্তি হতে পারে না। অনুভূতির মনোজ্ঞতা বা অমনোজ্ঞতাই কোন ভোগ্য বস্তু গ্রহণ বা বর্জনের বাসনা জাগায়। বিকট দর্শন, কঠোর শব্দ যেমন বর্জনের বাসনা জাগায় ঠিক তেমনি মনোহর দর্শন, মধুর শব্দ, মিষ্টস্বাদ, সুগন্ধি এবং কোমল স্পর্শ তা'লাভ করার বাসনা বা তৃষ্ণা জাগায়।

প্রঃ কিসের কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়?

উঃ বেদনার কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

প্রঃ কিসের নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয়?

উঃ বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয়।

প্রঃ তৃষ্ণা কাকে বলে?

উঃ জলন্ত অগ্নি শিখা দেখে পতঙ্গ যেমন প্রলুব্ধ হয়, প্রমত্ত আকর্ষণ অনুভব করে এবং আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা জাগে কিন্তু জানে না এর পরিণতি কি হবে। অনুরূপভাবে বেদনার বা রসানুভূতিতে জীব আকৃষ্ট হয়ে রূপের প্রতি, শব্দের প্রতি, গন্ধের প্রতি, রসের প্রতি, স্পর্শের প্রতি এবং মনোগোচর বিষয়ের প্রতি। এ আকর্ষণকে বলা হয় তৃষ্ণা বা আসক্তি। আকর্ষণ যত গভীর হয় তৃষ্ণাও তত প্রবল হয়।

প্রঃ তৃষ্ণার স্বরূপ কি?

উঃ যে সমস্ত বস্তু বা দৃশ্য উপেক্ষা বেদনার সৃষ্টি করে সেগুলির প্রতি ব্যক্তি সাধারণতঃ নিরপেক্ষ থাকে। কেননা ঐটির প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কোনটাই সে অনুভব করে না। যে সমস্ত বস্তু তার পক্ষে বেদনাদায়ক ও দুঃখকর সেগুলি থেকেও সে সযত্নে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করে কিন্তু যে সমস্ত বস্তু তার পক্ষে সুখকর ও আনন্দদায়ক সেগুলির প্রতি তার একটি তৃষ্ণা বা আসক্তির সৃষ্টি হয়। যে মন তার প্রদুষ্ট স্বভাব ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিবন্ধন সর্বদা কাম ভোগের বস্তু নিচয়ের প্রতি আকাঙ্খা বা আসক্তির সৃষ্টি করে সে মনের তৎকালীন অবস্থার উপরেই সুখ বা দুঃখের অনুভূতি নির্ভর করে।

প্রঃ বিষয়ানুসারে তৃষ্ণাকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি?

উঃ ছয় ভাগে। যথা- ১। রূপ তৃষ্ণা, ২। শব্দ তৃষ্ণা, ৩। গন্ধ তৃষ্ণা, ৪। রস তৃষ্ণা, ৫। স্পর্শ তৃষ্ণা ও ৬। ধর্ম তৃষ্ণা।

প্রঃ রূপ তৃষ্ণা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ চক্ষুর সাথে দৃশ্যমান বিষয়ের সংস্পর্শে বেদনা থেকে রূপ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

প্রঃ শব্দ তৃষ্ণা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ কর্ণের সাথে শব্দের সংস্পর্শে বেদনা থেকে শব্দ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

প্রঃ গন্ধ তৃষ্ণা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ নাসিকার সাথে যাবতীয় গন্ধের সংস্পর্শে অনুভূতি থেকে গন্ধ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

প্রঃ রস তৃষ্ণা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উঃ জিহ্বার সাথে বস্তুর সংস্পর্শে রসানুভূতিতে রস তৃষ্ণা সৃষ্টি হয়।

প্রঃ স্পর্শ তৃষ্ণার উদ্ভব কিভাবে?

উঃ কায়ের সাথে বিষয়ের সংস্পর্শ হেতু বেদনা থেকে স্পর্শ তৃষ্ণা।

প্রঃ ধর্ম তৃষ্ণা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ মনের সাথে আলম্বনের সংস্পর্শে বেদনা বা অনুভূতি হেতু ধর্মতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

প্রঃ সাধারণতঃ তৃষ্ণা কত প্রকার ও কি কি?

উঃ তিন প্রকার। যথা– ১। কামতৃষ্ণা, ২। ভব তৃষ্ণা ও ৩। বিভব তৃষ্ণা।

প্রঃ কামতৃষ্ণা কাকে বলে?

উঃ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম প্রভৃতি ছয় বিষয়বস্তুর বা আলম্বনের যে কোনটি উপভোগের জন্য উৎপন্ন তৃষ্ণা যখন কাম রস সিক্ত, কামনালিপ্ত হয়, তখন তাকে বলে কামতৃষ্ণা। এককথায় একে ভোগতৃষ্ণা বলা হয়।

প্রঃ ভব তৃষ্ণা বলতে কি বুঝায়?

উঃ মিথ্যা ধারণার বশীভূত বিভ্রান্ত মন মরু মরীচিকার মত সারহীন অনিত্য অশাশ্বত জগৎকে সারযুক্ত নিত্য ধ্রুব বলে কল্পনা করে ভাবে, তখন তার মিথ্যা ধারণা সংযুক্ত তৃষ্ণা ভবানুরাগে রূপান্তরিত হয়। একে বলা হয় ভব তৃষ্ণা। মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, রূপলোকে, অরূপলোকে উৎপত্তির তৃষ্ণা ভব তৃষ্ণা।

প্রঃ বিভব তৃষ্ণা কাকে বলে?

উঃ "এ ভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হলে ফিরে আসবে না অর্থাৎ দেহান্তে অস্তিত্বের রেখা মুছে যাবে নতুন জন্ম হবে না। অতএব মৃত্যুর পর সুখ দুঃখ ভোগের প্রশ্ন নেই, যতদিন বেঁচে থাক, খাও দাও, ভোগ কর, সুখে দিন কাটাও।" এ রকম ধারণায় মন যখন আচ্ছন্ন হয়, তখনি বিভব তৃষ্ণা জাগে। জীবন ফিরে পাওয়া যাবে না এ ধারণায় জীবনকে ভোগ করার বাসনা উদ্দাম হয়ে উঠে। উচ্ছেদ দৃষ্টি সমন্বিত ভোগবাসনাই বিভব তৃষ্ণা। মৃত্যুর পর পরজীবন অনস্তিত্ব দৃষ্টিই বিভব তৃষ্ণা।

প্রঃ তৃষ্ণার কারণে কিসের উৎপত্তি হয়?

উঃ উপাদানের উৎপত্তি হয়।

প্রঃ তৃষ্ণার নিরোধে কিসের নিরোধ হয়?

উঃ উপাদানের নিরোধ হয়।

প্রঃ উপাদান বলতে কি বুঝায় বা তৃষ্ণা দ্বারা কিভাবে উপাদান উৎপন্ন হয়।

উঃ ভোগে তৃষ্ণা মিঠে না। যতই ভোগ করা হয় তবুও তৃষ্ণা যেন অপূর্ণই থেকে যায় এবং তা'ঘৃতসিক্ত অগ্নির মত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। তৃষ্ণার আধিক্য থেকে উপাদান আসে। উপাদান বলতে বোঝায় উপ+আদান অর্থাৎ দৃঢ় গ্রহণ। সহজ কথায় বলতে গেলে বুভুক্ষু মনের উদ্দাম ভাবই উপাদান। অক্টোপাস যেমনি জড়িয়ে ধরে তার শিকারকে, তেমনি উপাদান বিষয়কে আপনার নাগ পাশে আবদ্ধ করে। তার বাঁধন দুশ্চেদ্য। তৃষ্ণা যখন প্রবল হয় তখন তা' উপাদানে পরিণত হয় এবং তা অতি সুক্ষরূপে চিত্তে স্থিত থাকে। এ উপাদানও স্বয়ম্ভু বা স্বয়ং জাত নয়। এটি বাসনার উপর নির্ভরশীল। বাসনার অবিদ্যমানতায় উপাদানের উৎপত্তি সম্ভব নয়। আমাদের কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জনের বাসনা যখন দৃঢ় বা গাঢ় হয় তখন আমরা তদুদ্দেশ্যে ঝুলে পড়ি, আপ্রাণ চেষ্টা করি ও সংগ্রামে রত হই। এটি উপাদান বা বাসনা তৃষ্ণার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

প্রঃ উপাদান কত প্রকার ও কি কি?

উঃ চার প্রকার। যথা–

১। কামোপাদান। ২। দৃষ্টোপাদান।

৩। শীলব্রতোপাদান ও ৪। আত্মবাদোপাদান।

প্রঃ কামোপাদান বলতে কি বুঝায়?

উঃ পঞ্চকামের প্রতি বা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের প্রতি বুভুক্ষু মনের দৃঢ় আসক্তিই কামোপাদান। বিশুদ্ধি মার্গের ভাষায় বলতে গেলে কাম্য বস্তুর প্রতি কামচ্ছন্দ, কামরূপ, কামনন্দন, কাম তৃষ্ণা, কাম স্নেহ, কাম পরিদাহ, কামমুর্ছনা, কামমগ্নতাই কামোপাদান। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুতে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ বা ধারণ।

প্রঃ দৃষ্ট উপাদান কি?

উঃ ভ্রান্ত দৃষ্টি বা মিথ্যা ধারণার কলুষিত উপাদান কে দৃষ্টি উপাদান বলে। মিথ্যা ধারণায় আচ্ছন্ন মনের আসক্তি হয় ঘনীভূত। সে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ভ্রান্ত মতবাদকে আঁকড়ে থাকে। তার এ ধরণের দৃঢ় গ্রহণ দৃষ্টি উপাদান। যাবতীয় তৃষ্ণার বিষয়কে নিত্য শাশ্বত সুখ ও শুভ মনে করে দৃঢ়ভাবে

ধারণ করাকে দৃষ্টি উপাদান বলে।

প্রঃ শীলব্রত উপাদান কাকে বলে?

উঃ নানারকম শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানকে চরম লক্ষ্যের পথ ভেবে তার প্রতি তীব্র অনুরাগ ব্রতচারীকে মাতাল করে তোলে। এ শুষ্ক ব্রতচর্য্যার সাথে একাত্ম হয়ে সে তাকে আঁকড়ে থাকে। একে শীল ব্রতোপাদান বলে। তৃষ্ণার বিষয়কে স্থায়িত্ব দানের জন্য বৃত, কৃচ্ছ্রসাধন ও তাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কে শীল ব্রতোপাদান বলে।

প্রঃ আত্মোবাদ উপাদান বলতে কি বুঝায়?

উঃ শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস। দৃঢ় আসক্তি দেহমনের প্রতি এবং দেহ মন সম্পর্কিত সকল বিষয়ের প্রতি। 'আমার দেহ' 'আমার মন' 'এ দেহমন নিয়েই আমি আছি' "দেহমনে আমার আত্মা" এভাবে আমিত্ব মমত্ববোধে নিমগ্ন হওয়া বা 'আমি' 'আমার' ধারণায় আচ্ছন্ন থাকাকে আত্মবাদোপদান বলে।

প্রঃ উপাদানের কারণে কিউৎপন্ন হয়?

উঃ ভব উৎপন্ন হয়।

প্রঃ উপাদানের কারণে কিসের নিরোধ হয়?

উঃ ভবের নিরোধ হয়।

প্রঃ উপাদান কিভাবে ভবের উৎপত্তি ঘটায়?

উঃ যতই ভোগে তৃপ্তি খোঁজে তার প্রতি ততই আসক্তি হয় ঘনীভূত। ফলে বিষয়বস্তুর প্রতি লোভ প্রবল বৃদ্ধি পায়। ভোগ পরিতৃপ্তির পথে যখন বাধা আসে, তা'ক্রোধ বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। লোভের ভিতর দিয়েই হোক, দ্বেষের ভিতর দিয়ে হোক অথবা মোহের কারণেই হোক উপাদানের দৃঢ়বন্ধন জীবনকে ভবের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

প্রঃ উপাদানের কার্যের উপর নির্ভর করেই ভবের উৎপত্তি কিরূপ?

উঃ এ সংসারে আমরা যে সমস্ত বিষয় পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলাই আমাদের জাগতিক জীবন। এ সামঞ্জস্য বিধানের বিধান করে চলাই আমাদের জগিতিক জীবন। এ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আমাদের কতকগুলি জিনিষ গ্রহণ ও কতগুলি জিনিষ বর্জন আবার কতগুলি জিনিষের গ্রহণ বা বর্জন কোনটির প্রয়োজন হয় না। শেষোক্তিটি বাদ দিলে গ্রহণ ও বর্জনের আকাঙ্খা যখন উদ্‌গ্ররূপ ধারণ করে তখন তাকে আমরা প্রবল আকাঙ্খা বা উপাদান রূপে অভিহিত করি। এ উপাদানই আমাদেরকে সে অবস্থায় পৌঁছার উন্মুখ করে, যে

অবস্থায় আমাদের গ্রহন ও বর্জনের আকাঙ্খা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এ অবস্থায় পৌছার ইচ্ছার অপর নাম 'ভব'। অবিচ্ছিন্ন উপাদান সম্ভুত 'ভব' শৃঙ্খলই বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের জীবন।

প্রঃ "ভব" বলতে কি বুঝায়?

উঃ ভব শব্দের অর্থ হওয়া বা হওয়ার আকাঙ্খা। কর্ম সম্পাদিত হয় এবং উৎপন্ন হয় এ অর্থে ভব।

প্রঃ ভব কত প্রকার ও কি কি?

উঃ দুই প্রকার। যথা- ১। কর্ম ভব ও ২। উৎপত্তি ভব।

প্রঃ কর্ম কি?

উঃ কর্মই কর্ম ভব। কুশল কর্ম, অকুশলকর্ম চেতনা, সংস্কার ইত্যাদি কর্মভব। এটি জীবনের সক্রিয় অংশ। যেমন- অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব।

প্রঃ উৎপত্তিভব কি?

উঃ কর্মদ্বারা উৎপন্ন স্কন্ধই উৎপত্তিভব। উৎপত্তিভব হচ্ছে বিশ্বজগৎ। এটি জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। যেমনঃ বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা।

প্রঃ উৎপত্তিভব কত প্রকার ও কি কি?

উঃ নয় প্রকার। যথা–

১। কাম ভব, ২। রূপ ভব, ৩। অরূপভব, ৪। সংজ্ঞাভব (সংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্ব) অর্থাৎ অসংজ্ঞসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সকল ভব, ৫। অসংজ্ঞাভব। (এটি চতুর্থধ্যানির অসংজ্ঞ সত্ত্ব ভব, চেতনাহীন সত্ত্ব, তাঁদের কর্মজ রূপপ্রবাহ বিদ্যমান)। ৬। নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞাভব (চতুর্থ অরূপভূমি)। ৭। এক স্কন্ধভব [রূপস্কন্ধ সম্পন্ন ভব (অসংজ্ঞসত্ত্বভব)] ৮। চার স্কন্ধভব (এতে রূপস্কন্ধ ব্যতীত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ বিদ্যমান) ও ৯। পঞ্চস্কন্ধভব (অসংজ্ঞসত্ত্ব ভব ও অরূপভব ব্যতীত সকল কাম ও রূপভব)।

প্রঃ কর্মভব ও রূপভবের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

উঃ উপাদান বা দৃঢ় আসক্তি জীবকে কর্মে লিপ্ত করে অর্থাৎ দৃঢ় আসক্তির জন্যই জীব সকাম সম্পাদনে রত হয়। বীজ উপ্ত হলে তার বৃক্ষোৎদ্গম যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি কর্মের অনুধাবনরূপে কর্মবীজ উপ্ত হলে তার পরিণতিতে উৎপত্তিভব বা বিশ্বজগৎ ও অবশ্যম্ভাবী। নতুবা কর্মফল ভোগের অবকাশ কোথায়। অতএব কর্মভব ও উৎপত্তিভব পরস্পর সম্বন্ধ

যুক্ত।

প্রঃ কর্মভব ও উৎপত্তিভবের স্বরূপ কিরূপ?

উঃ কর্মানুসারে যখন জীবের জন্ম নিয়ন্ত্রিত, তখন ভব বৈচিত্র ও অপরিহার্য। সহজ কথায় সুকর্ম সুগতি লাভের সহায় হয় এবং দুস্কর্ম দুর্গতি ভবে নিয়ে যায়। এভাবে কর্ম তার অন্তর্নিহিত শক্তি বলে ফল ভোগের উপাদান স্বরূপ অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরযুক্ত ভব বা জগত প্রবর্তন করে যেখানে জীবন আপন আপন কর্ম অনুসারে অনন্ত পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলে। কর্মভবই হোক আর উৎপত্তিভবই হোক; তার মূলে আছে উপাদান বা দৃঢ় আসক্তি। মনে করুন অন্যের অধিকৃত কোন জিনিষ আমার পছন্দ হওয়ায় ঐটি পাওয়ার ইচ্ছা মনে জাগ্রত হল। ভোগ চিত্তজাত আমার এ ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উদগ্র আকাঙ্খায় পরিণত হল অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত হল যে, উক্ত জিনিষটি আমার পেতেই হবে, যে কোন উপায়েই হউক। এ জিনিষটি পাওয়ার জন্য মন সদা সর্বদা চঞ্চল এবং মনে মনে অসংখ্য পরিকল্পনা উৎপন্ন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে কিভাবে বস্তুটি পেতে পারি। এ উদগ্র আকাঙ্খাই উপাদান। মন তখন চিন্তা করে কিভাবে বা কি উপায়ে জিনিষটি পেতে পারি। মন তখন সিদ্ধান্ত করে তিনটি উপায়ে জিনিষটি আমি পেতে পারি। যেমন–

১। জিনিষটি মালিকের কাছ থেকে চুরি করে নিতে পারি।

২। জোড় করে কেড়ে নিতে পারি।

৩। তার কাছে ভিক্ষা চেয়ে বা অনুনয় বিনয় করে নিতে পারি।

মন আরো চিন্তা করে চুরি করতে গেলে আমাকে চোর হতে হবে, কেড়ে নিতে গেলে সন্ত্রাসী হতে হয়, অথবা ভিক্ষা চেয়ে নিতে হলে ভিখারী হতে হয়। চোর, সন্ত্রাসী বা ভিক্ষাবৃত্তি এগুলি অশোভনীয় কাজ। লোকে ধিক্কার দেবে, হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে। এসব চিন্তা চেতনাও মনে উদয় হয় পূর্বের কুশল প্রভাবে কিন্তু লোভ দ্বেষ মোহের কারণে আসক্তি প্রবল হয়। তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়, বিচার জ্ঞান দুর্বল হয়। যা হউক জিনিষটির প্রতি যেহেতু আমার দুর্বার আকাঙ্খা এখন পাওয়ার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করছে আমি কোন পথ অবলম্বন করব অর্থাৎ কোনটা হলে যে আমার ইচ্ছা নিশ্চিত পূর্ণ হবে তার উপরই নির্ভর করছে আমি কি হব এবং সেটি হওয়ার ইচ্ছাই হল "ভব"। বস্তুতঃ উপাদানের উপর নির্ভরশীল এরূপ অনেকগুলি "ভব" এর শৃঙ্খলই হল আমাদের জীবন।

প্রঃ জন্মের কারণে কি উৎপন্ন হয়?

উঃ জাতি উৎপন্ন হয়।

প্রঃ ভবের কারণে কিসের নিরোধ হয়?

উঃ জাতির নিরোধ হয়।

প্রঃ জাতি বলতে কি বুঝায়?

উঃ জাতি বলতে এখানে জন্ম, জীবের জীবত্বের বিকাশ, পঞ্চ স্কন্ধের প্রাদুর্ভাব, দেবকুলে, মনুষ্যকুলে, তির্যককুলে, যেখানেই হোক না কেন জীবনের উৎপত্তিকে বলা হয় জাতি বা জন্ম। ইন্দ্রিয়োভোগ্য বস্তু নিচয় ভোগ করার ঐ উদ্দেশ্য ব্যক্তির পক্ষে কেবল তখন সিদ্ধ হয় যখন পূনর্জন্মের কার্যকারণ হিসেবে 'ভব' ব্যক্তির শারীরিক প্রকাশ্য বা আবির্ভাব অর্থাৎ জাতি বা জন্ম ঘটায়। কর্মবেগ বা চিত্ত প্রবৃত্তি হেতুরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে পূনর্জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রঃ জন্ম অর্থ কি?

উঃ মাতৃজঠরে নামরূপের উৎপত্তি এবং সশরীরে নামরূপে উৎপত্তির অর্থ জন্ম।

প্রঃ মাতৃ জঠরে কারা উৎপন্ন হন?

উঃ মনুষ্য এবং তীর্যক কুলে জন্মগ্রহনকারী সত্ত্বগণ উৎপন্ন হন।

প্রঃ জন্ম কত প্রকার?

উঃ চার প্রকার। যথা– অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও উপপাতিক।

প্রঃ জাতির ভেদাভেদ কিসের উপর নির্ভর করে?

উঃ কর্ম অর্থাৎ সত্ত্বগণের অর্জিত শুভাশুভ কর্মই এ ভেদ সৃষ্টি করে।

প্রঃ কর্মের সাথে জন্মের সম্পর্ক কিরূপ?

উঃ বীজের সঙ্গে বৃক্ষের যে সম্বন্ধ কর্মের সঙ্গে জন্মান্তরের সম্বন্ধও ঠিক তাই। কর্মের আবর্তনে জন্ম জন্মান্তরের অনন্ত বিস্তারে জীবের সুখ দুঃখের খেলা নিয়ন্ত্রিত। এজন্য কর্মকে বলা হয় ভববীজ। তাই কার্যকারণ শৃঙ্কলায় উক্ত হয়েছে ভবের কারণে জন্ম। এখানে ভব বলতে কর্ম ভবকে বোঝায় অর্থাৎ কর্মই জন্মের কারণ।

প্রঃ সত্ত্বগণের স্ব স্ব কর্মের প্রভাবে কোথায় কোথায় উৎপন্ন হতে পারে?

উঃ একত্রিশ লোকভূমিতে। যথা– চার অপায়, এক মনুষ্যলোকে, ছয় দেবলোকে, ষোল রূপ ব্রহ্মলোকে এবং চার অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হতে পারে।

প্রঃ জন্মের কারণে কি হয়?

উঃ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

প্রঃ জন্ম রোধ হলে কি হয়?